আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তাবুক যুদ্ধ - নবম হিজরীর রজব মাসে (غــزوة تبــوك في رجب سنة ٩هـ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

যুদ্ধ পরিক্রমা (نَظْرَةٌ عَلَى الْغَزَوَاتِ):

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর পরিচালনায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ, যুদ্ধাভিযান ও সৈনিক মহোদ্যম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার পর যুদ্ধের পটভূমি, পরিবেশ, পরিচালনা, নিকট ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি বিচার বিশ্লেষণ করবেন তাঁকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ এবং সমর নায়ক। শুধু তাই নয়, তাঁর সমরাদর্শও ছিল সকল যুগের সকল সমর নায়কের অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কিত উপলব্ধি ও অনুধাবন ছিল সঠিক ও সময়োপযোগী, অর্ন্তদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর এবং সিদ্ধান্ত ছিল সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাপ্রসূত। রিসালাত ও নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন রাসূলগণের সরদার (সাইয়্যিদুল মুরসালীন) এবং ছিলেন নাবীকুল শিরোমণি (আ’যামুল আমবিয়া)। সৈন্য পরিচালনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব এবং একক গুণের অধিকারী। যখনই কোন যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তখই দেখা গেছে যে, যুদ্ধের স্থান নির্বাচন, সেনাবাহিনীর বিন্যাস ব্যবস্থা, সমর কৌশল, সমরাস্ত্রের ব্যবহার বিধি , আক্রমণ, পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারে তিনি সাহসিকতা, সতর্কতা ও দূরদর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সমর পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি হয় নি এবং এ কারণেই মুসলিম বাহিনীকে কখনই কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয় নি।

অবশ্য উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমর পরিকল্পনা কিংবা সমর কৌশলের ত্রুটি কিংবা ঘাটতির কারণে এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)’র নির্দেশিত কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করলে এ বিপর্যয়ের কোন প্রশ্নই আসত না। এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের ভুল ধারণা এবং দুর্বল মানসিকতা থেকে। উহুদ যুদ্ধে যে ইউনিটকে গিরিপথে পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁদের ভুল বুঝাবুঝির কারণেই সেদিন কিছুটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। হুনাইন যুদ্ধের দিন কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যয়ে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের কিছুটা মানসিক দুর্বলতা এবং শত্রুপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ার কারণে।

উল্লেখিত দুই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে নাবী কারীম (ﷺ) যে অতুলনীয় সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন মানব জাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই ছিলেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকার মুখেও পর্বতের ন্যায় অটল অচল থাকার কারণেই বিপর্যস্ত প্রায় মুসলিম বাহিনী ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়ের গৌরব।

ইতোপূর্বে যে আলোচনা করা হল তা ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত। কাজেই, যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াও এমন কতগুলো সমস্যা যেগুলো ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা সে সকল সমস্যার সমাধান করে নাবী কারীম (ﷺ) তৎকালীন আরব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন, অশান্তি ও অনিষ্টতার অগ্নি নির্বাপিত করেন, মূর্তিপূজার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী

সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং আপোষ ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুশরিকদের বৈরিতার অবসান ঘটান। তাছাড়া সে সকল সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিক্বদের সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের ষড়যন্ত্র এবং ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে মুসলিমগণকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

অধিকন্তু, বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী মোকাবেলায় লিপ্ত হয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টির মাধ্যমে এত যুদ্ধাভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে মুসলিম বাহিনীকে তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী কালে এ বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে বিশাল বিশাল পারস্য ও রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করার পর তাদের বাড়িঘর, সহায় সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা ও ক্ষেতখামার থেকে বিতাড়িত করেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে সকল যুদ্ধের মাধ্যমে হিজরতের কারণে ছিন্নমূল মুসলিমগণের আবাসভূমি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আয় উপার্জনহীন শরণার্থীদের জন্য উত্তম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের উপযোগী সরঞ্জামামি, ঘোড়া এবং যুদ্ধের ন্যায় নির্বাহের জন্য অর্থ সম্পদ ইত্যাদিও সংগ্রহ করে দেন, অথচ এ সব করতে গিয়ে কখনই তিনি বিধিবহির্ভূত কোন ব্যবস্থা, অন্যায় কিংবা উৎপীড়নের পথ অবলম্বন করেননি।

যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং নীতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। জাহলিয়াত যুগে যুদ্ধের রূপ ছিল লুটতরাজ, নির্বিচার হত্যা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন, ধর্ষণ, নির্যাতন, কায়ক্লেশ ও কঠোরতা অবলম্বন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম জাহেলী যুগের সে যুদ্ধ নামের দানাবীয় কান্ডকারখানাকে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে পবিত্র জিহাদে রূপান্তরিত করেন। জিহাদ হচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করে ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। জিহাদ বা সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি, অন্যায় উৎপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অপহরণ, অহেতুক হত্যা ইত্যাদি কোন কিছুরই সামান্যতম অবকাশও ছিল না। ইসলামে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হত।

শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা, সাক্ষাত সমরে যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্দী, যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে নিয়ম নীতি অনুসরণ করেছিলেন সর্বযুগের সমর বিশারদগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভূমি কিংবা সম্পদ দখল, সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা আধিপত্যের সম্পসারণ নয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে সত্যের পথে আনয়ন, ন্যায় ও কল্যাণ ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন, সকল প্রকার ভূয়া আভিজাত্যের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে অভিন্ন এক মানবত্ববোধের উন্মেষ ও লালন। অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার স্থলে মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন এবং নিরাপদ ও শান্তি স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيْرًا) [النساء:75]

‘এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের জন্য, যারা দু‘আ করছে- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ

যালিম অধ্যূষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।' [আন-নিসা (৪) : ৭৫]

যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল মানবোচিত আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান কিংবা সাধারণ সৈনিকগণ যাতে কোনক্রমেই তার অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা এড়িয়ে না যান তার প্রতি তিনি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

সোলায়মান বিন বোরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন ব্যক্তিকে কোন মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা অভিযাত্রী দলের নেতা নির্বাচিত করতেন তখন গন্তব্যস্থলে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ভাল মন্দের ব্যাপারে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করতেন। অতঃপর বলতেন,

(أُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، أُغْزُوْا، فَلَا تَغُلُّوْا، وَلَاتَغْدِرُوْا، وَلَا تَمْثِلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْداً...)

'আল্লাহর নির্দেশিত পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে, যারা আল্লাহর কুফরী করেছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ন্যায় সঙ্গতভাবে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের কোন ব্যক্তির নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না।' - শেষপর্যন্ত।

অনুরূপভাবে নাবী কারীম (ﷺ) সহজভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন এবং বলতেন, (يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا) 'সহজভাবে কাজ করো, কঠোরতা অবলম্বন করো না। মানুষকে শান্তি দাও, ঘৃণা করো না[1]

যখন তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তির নিকট রাত্রে গমন করতেন তখন সকাল হওয়ার পূর্বে কখনই তিনি আক্রমণ করতেন না। কোন শত্রুকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কোন ব্যক্তিকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করতে এবং মহিলাদের মারধর এবং হত্যা করতেও নিষেধ করতেন। লুণ্ঠন কার্যকে তিনি কঠোর ভাবে নিরুৎসাহিত করে বলতেন, (إِنَّ النُّهْبٰى لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ) 'লুণ্ঠন-লব্ধ মাল মুর্দার চাইতে অধিক পবিত্র নয়।' তাছাড়া ক্ষেতখামার নষ্ট করা, পশু হত্যা এবং অহেতুক গাছপালা কেটে ফেলতে তিনি নিষেধ করতেন। অবশ্য যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে গাছপালা কেটে ফেলার অনুমতি যে তিনি দিতেন না তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও না।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালেও নাবী কারীম (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন,(لَا تُجَهِّزَنَّ عَلٰى جَرِيْحٍ، وَلَا تَتَّبِعَنَّ مُدْبِراً، وَلَا تَقْتُلَنَّ أَسِيْراً) আহত ব্যক্তিদের আক্রমণ করবে না, কোন পলাতকের পিছু ধাওয়া করবে না, এবং কোন বন্দীকে হত্যা করবে না, কোন কওম কিংবা রাষ্ট্রের দূতকে হত্যা করবে না।'

অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিম দেশের নাগরিকদেরও হত্যা করতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَاماً) 'কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরেরও অধিক পথের দূরত্বে পাওয়া যাবে।'

উল্লেখিত বিষয়াদির বাইরে আরও অনেক উন্নত মানের নিয়ম-কানুন তিনি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন যার

ফলে তাঁর সমর কার্যক্রম জাহেলিয়াত যুগের পৈশাচিকতা ও অপবিত্রতার কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জিহাদের রূপ লাভ করে।

ফুটনোট

[1] সহীহুল মুসলিম ২য় খন্ড ৮২-৮৩ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6435

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন